Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিদ্যাপতি

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.1
Pages	1-29
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিদ্যাপতি

সৈয়দ আলী আহসান

বিদ্যাপতি ছিলেন চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি। তিনি বাঙালি ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিথিলাবাসী। তাঁর মাতৃভাষা ছিলো মৈথিলী। তাঁর রচিত গ্রন্থ এবং পদাবলীর ভাষাও বাংলা নয়। সেগুলোর ভাষা মৈথিলী এবং সংস্কৃত। তবুও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির আলোচনা ঐতিহাসিক এবং ভাবগত দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। বাঙালি পাঠকের কাছে এই কবির জনপ্রিয়তা অসম্ভব রকমের আর তাঁর কাব্য বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে। শ্রীচৈতন্য দেব বিদ্যাপতির কাব্যরস পানে হতেন বিহবল। শুধু তাই নয় আধুনিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের কাছেও বিদ্যাপতির আবেদন ছিল বিস্ময়কর।

এই অবাঙালি কবি দ্বারভাঙ্গার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে নানা মতদ্বৈধতা রয়েছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৬০— এই সময়কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। অধিকাংশ গবেষক এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তবে এর বিরোধিতাও করেছেন অনেকে। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন বিদ্যাপতি ১৩৬০–৬৫ সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তবে বিদ্যাপতির জন্মতারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, প্রায় ৬০ বছর তিনি কাব্যচর্চা করেছিলেন এবং পঞ্চদশ শতকের কবি ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর কাব্যচর্চার কালটি অন্ততপক্ষে পঞ্চদশ শতক।

বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী রচনা করলেও তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি ছিলেন শৈব। তবে তিনি শৈব হলেও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের প্রতি সমদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কথিত আছে তিনি নাকি শিবমন্দির

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার দুর্গা, গঙ্গা, কালীকে ভক্তি নিবেদন করে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থও লিখেছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে কবির সুনিবিড় হৃদয়াকূতির উজ্জ্বল প্রকাশে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে কবিকে বৈষ্ণব বলে আখ্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুসারী এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিদ্যাপতিকে মিলিয়ে ফেলা এবং বৈষ্ণব হিসেবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক। বিদ্যাপতির আবির্ভাবও ঘটেছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আনুমানিক একশ বছর আগে। অনেকে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের প্রতি কবির উদারতা এবং শ্রদ্ধা দেখে কবিকে পঞ্চোপাসক হিন্দু বলেও অভিহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সব কিছুর পরও কুলধর্মের দিক দিয়ে শৈব মতের প্রতি তাঁর ছিল আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা।

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। কবির পূর্বপুরুষগণ মিথিলার রাজসভার সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন নানা ভাবে। অনেকে ছিলেন রাজসভাপণ্ডিত, অনেকে আবার ছিলেন সেনাপতি। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষগণ রাজসভার উচ্চপর্যায়ের সঙ্গেই ছিলেন সংশ্লিষ্ট। বিদ্যাপতি অবশ্য কোনো রাজকীয় পদ নেননি। তিনি মূলত ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত এবং মৈথিলী ভাষার বিশিষ্ট কবি ও পদকার। মিথিলারাজ শিবসিংহের সঙ্গে কবির বিশেষ সখ্যতা ছিলো। তবে শিবসিংহের সঙ্গে কবির বিশেষ ভাব থাকলেও কামেশ্বর বংশের প্রায় সবাই কবিকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, কবির কাব্যচর্চায় করেছেন পৃষ্ঠপোষকতা। কামেশ্বর বংশের ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ পর্যন্ত সব রাজা, রাজকুমার ও রাণীর প্রশংসাসূচক ভণিতা পাওয়া যায় বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদে। তাছাড়া তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থে কামেশ্বর বংশীয় অনেক রাজার নাম তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বাংলায় বিদ্যাপতির প্রধান পরিচয় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক তথা বৈষ্ণব পদকার হিসেবেই। কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু বৈষ্ণব পদাবলীই লিখেননি। তিনি শাক্ত, শৈব এবং অন্যান্য বিষয়ক পদও রচনা করেছেন। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নিচে তাঁর কিছু গ্রন্থের তালিকা এবং পৃষ্ঠপোষকের নাম দেয়া হল।

গ্রন্থ	পৃষ্ঠপোষক
১ *ভূপরিক্রমা*	দেবসিংহ
২ *কীর্তিলতা*	কীর্তিসিংহ
৩ *কীর্তিপতাকা*	শিবসিংহ
৪ *পুরুষপরীক্ষা*	শিবসিংহ

৫ শৈবসর্বস্বসার ও গঙ্গাবাক্যাবলী	পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবী
৬ বিভাগসার দানবাক্যাবলী	নরসিংহ ও ধীরমতি
৭ লিখনাবলী	পুরাদিত্য
৮ দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী	ভৈরবসিংহ

সমালোচকদের বিশ্বাস ভূপরিক্রমা বিদ্যাপতির প্রথম গ্রন্থ। এটি রচিত হয়েছিল ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। এতে মিথিলা থেকে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত যাবতীয় তীর্থের বর্ণনা করেছেন কবি। এ-সময় কবি দেবসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাস করতেন। ইতিপূর্বে অর্সলান কর্তৃক মিথিলা রাজ্য বিজিত হয়েছিল। বিধ্বস্ত হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করবার একটি উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল এ গ্রন্থের তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনার পেছনে। অবহট্‌ঠ ভাষায় গদ্য পদ্যে রচিত কবির *কীর্তিলতা* গ্রন্থটি। গ্রন্থটি বিখ্যাত হয়ে আছে কবির ইতিহাস-অনুগামী কালসচেতনতার কারণে। কীর্তিসিংহের বীরত্বের এবং পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য। মৃত গএনেসের দুই পুত্র বীরসিংহ এবং কীর্তিসিংহ কিভাবে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহের সাক্ষাৎ পেলেন, সুলতানের সহায়তায় কিভাবে যুদ্ধে অর্সলানকে পরাজিত এবং নিহত করে পিতৃরাজ্য ত্রিহুত পুনরাধিকার করলেন তাই বর্ণিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। কীর্তিসিংহ পিতৃ রাজ্য পুনরাধিকার করে বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজকে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে জৌনপুরের নাগরিক ঐশ্বর্যের যে বর্ণনা রয়েছে তা বেশ উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয়। বিদ্যাপতির *কীর্তিপতাকা* গ্রন্থটিও অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত। এর বর্ণিত বিষয় হচ্ছে শিবসিংহের কীর্তি এবং প্রণয়। এ-ছাড়া বিদ্যাপতির অন্যসব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এগুলোর অধিকাংশই স্মৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধীয়। তবে *পুরুষপরীক্ষা* এবং *লিখনাবলী* গ্রন্থ দুটোর মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলোর জন্য বিদ্যাপতি যত খ্যাতিই লাভ করুন না কেন পদাবলীতেই বিদ্যাপতি-প্রতিভার চরম স্ফূর্তি লাভ ঘটেছে এবং পদাবলীতেই আমরা এই মৈথিলী কবিকে পাই নিবিড় এবং আন্তরিকভাবে। বিদ্যাপতি বিভিন্ন শ্রেণীর পদ রচনা করেছেন। যেমন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ, হরগৌরী ও কালীবিষয়ক পদ, গঙ্গাবিষয়ক পদ, প্রহেলিকাজাতীয় পদ, এছাড়াও দেবতা-সম্পর্কবিবর্জিত বিভিন্ন ধরনের কিছু পদও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হরগৌরী এবং কালীবিষয়ক পদগুলো নানা দিক দিয়ে বেশ আবেদন সৃষ্টি করে। এগুলোর বিষয়

উপস্থাপনা, রচনাকৌশল, ভাষার দৃঢ়বদ্ধতা এবং ভক্তির গাম্ভীর্য কবির শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করে। তবে বাংলায় বিদ্যাপতির খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার উৎসমূল রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী। এই পদাবলীর জন্যই কবি বাঙালির অন্তরে চিরস্থায়ী আসনটি করে নিয়েছিলেন। কবিত্ব, রচনারীতি, বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, ভক্তিরস, কবিহৃদয়ের নিবিড় আকূতি, মানবিক আবেদন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীতে এমন উজ্জ্বলতর হয়ে আছে যে, যা কবিকে ক'রে তুলেছে অনন্যসাধারণ। তিনি এ পদগুলো তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলীতেই রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাপতির যে সমস্ত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত সেগুলোতে বিশুদ্ধ মৈথিলী ভাষা নেই, নেই সঠিক মৈথিলী ব্যাকরণ। এতে অনেক বাংলা শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। এর ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। মিথিলা থেকে বিদ্যাপতির পদগুলো লিখিত আকারে সরাসরি বাংলাদেশে আসেনি। এসেছে বিভিন্ন মানুষের মুখে মুখে। তখন বাংলাদেশ থেকে অনেক ছাত্র মিথিলায় যেত ন্যায়শাস্ত্র পড়ার জন্য। তাঁরা শুধু ন্যায়শাস্ত্র পাঠেই নিজেদের নিয়োজিত রাখতো না। বিদ্যাপতির অনন্যসাধারণ পদগুলোও তাদের আকৃষ্ট করত সমভাবে। ভক্তিরসে আবিষ্ট হয়ে তারা বিদ্যাপতির পদগুলো মুখস্ত করতো। তারা দেশে ফিরে এগুলো অন্যদেরকে শুনাত। কালক্রমে বাঙালির মুখে মুখে মৈথিলী ভাষার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেক বাংলা শব্দ পদগুলোতে ঢুকে পড়ে এবং খাপ খেয়ে যায়। এতে করে বিদ্যাপতির পদের ভাষা শেষ পর্যন্ত একটি মিশ্রভাষায় হয় রূপান্তরিত। এবং এ-ভাষার নামকরণ করা হয় ব্রজবুলি। পরবর্তীতে এই ব্রজবুলি ভাষায় অনেকে অনেক পদ রচনা করেছেন। কারণ বাঙালি পাঠক এবং বৈষ্ণব ভক্তরা মনে করতো এই ব্রজবুলি ব্রজের অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা। তাদের এও বিশ্বাস ছিলো যে, বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এবং সখীগণ এই ব্রজবুলি ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় এই সত্য আধুনিক কালে মীমাংসিত যে, ব্রজের ভাষার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এই ব্রজবুলিতে কেউ কোনোদিন কথা বলত না। এটি একটি কৃত্রিম ভাষা এবং বৈষ্ণব পদাবলী বা ঐ জাতীয় সাহিত্য ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃতও হয় নাই। মূলকথা হচ্ছে বিদ্যাপতি পদগুলো মৈথিলী ভাষায়ই রচনা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে পদগুলো বাংলা, আসাম, উড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারিত হলে অনেক স্থানীয় শব্দ মৈথিলী শব্দকে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পরে এবং একটি কৃত্রিম কবিভাষার সৃষ্টি করে— এই কৃত্রিম কবিভাষাটিই আসলে ব্রজবুলি।

বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত নয় শতেরও অধিক পদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচশত পদে রাধাকৃষ্ণ বা বৃন্দাবনের উল্লেখ রয়েছে। বাকীগুলোতে নেই।

এজন্য যে সমস্ত পদ প্রত্যক্ষভাবে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে জড়িত নয় সেগুলোকে অনেকেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ নয় বলতে চান। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নেই বিদ্যাপতির এমন অন্ততঃ আরো দুইশত পদকে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ বলে চিহ্নিত করা চলে নির্দ্বিধায়। একটি পদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে

যব— গোধূলি সময় বেলি
ধনি— মন্দির বাহির ভেলি
নবজলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারি গেলি।।
ধনী— অল্প বয়সী বালা
জনু— গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা।

এখানে পুরো পদটি উদ্ধৃত করা হয়নি। তবে এ পদের মত অসংখ্য পদ রয়েছে যেখানে রাধাকৃষ্ণের স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে অনুমান ঠিক নয় যে, বিদ্যাপতির এ পদগুলো নিছক সাধারণ প্রেমের কবিতা। এগুলোকে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ হিসেবে গণ্য করলে কোনো দোষের হবে না। এ সবের তাৎপর্য, কিম্বা পূর্ব-প্রসঙ্গ বিচার করে এগুলোকে সহজেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের বিভিন্ন লীলা বর্ণনার জন্য বিভিন্ন লীলা-পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। তবে বিদ্যাপতির রাধার বয়ঃসন্ধি, রাধাকৃষ্ণের পূর্বানুরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত, বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিষয়ক পদগুলো বিশেষ উজ্জ্বল এবং উৎকর্ষপূর্ণ। বিদ্যাপতির পদ নিয়ে আলোচনার শুরুতে একটি বিষয় বলে নেয়া উচিত যে, কালগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন চৈতন্য-পূর্ববর্তী তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবতত্ত্বের উপস্থিতি তাঁর পদে নেই বললেই চলে। চৈতন্যদেব তাঁর পদাবলীতে মুগ্ধ থাকায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যাপতির পদে বৈষ্ণবতত্ত্বের আরোপে থেকেছেন ব্যস্ত। তিনি সুন্দরের আরতির জন্য, ব্যক্তিহৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করার জন্য সর্বোপরি কাব্যসৃষ্টির চিরন্তন প্রেরণা থেকেই পদ রচনা করেছেন। চৈতন্যোত্তর কবিদের মত অধ্যাত্মচেতনা তথা বৈষ্ণবরসতত্ত্বের প্রকাশের জন্য পদ রচনা করেন-নি। কাব্যসৃষ্টির জন্যই পদ রচনা করেছেন এবং সে সূত্রেই অধ্যাত্মচেতনারও প্রকাশ ঘটেছে। তাই বিদ্যাপতির পদের মানবিক আবেদন এত বেশী। আর এ-কারণেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মানবিক প্রেমকাহিনীর

চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে এই কালোত্তীর্ণ কবির তুলির স্পর্শে।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলো নিশ্চয় ধারাবাহিকভাবে রচিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। অথচ এগুলোর মধ্য দিয়ে একটি ঘটনাপ্রবাহ যেমন ধরা পড়েছে তেমনি রাধা চরিত্রটি পূর্ণাঙ্গ আকারেও চিত্রিত হয়েছে। রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে ভাবসম্মিলন পর্যায় পর্যন্ত ক্রমিক রূপান্তরটি বিস্ময়কর এবং শিল্পগুণমণ্ডিত। বয়ঃসন্ধির পদ রচনায় তথা রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় কবি যে উচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা বৈষ্ণব সাহিত্যে তুলনারহিত। কিশোরী রাধার শারীরিক পরিবর্তন তথা যৌবনাগমন এবং ক্রমবিকাশ যেমন কবি বর্ণনা করেছেন শৈল্পিক নিষ্ঠায়, তেমনি তিনি রাধার মনোজগতের ক্রমিক পরিবর্তনটিও তুলে ধরেছেন সমান দক্ষতায়। উভয় ক্ষেত্রেই কবির সুন্দরের আরাধনা থেকেছে সমভাবে ক্রিয়াশীল। চিত্রের পর চিত্র উপস্থিত করে কবি তাঁর নান্দনিক এবং সৌন্দর্যানুভূতিকেই প্রকাশ করেছেন। রাধার দৈহিক পারবর্তনের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি এভাবে—

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ।
অবে মদন বঢ়ায়ল দীঠ
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ;
শৈশব ছোড়ল শশিমুখী দেহ
খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহ।
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ।
তারুন্য আগে তোহর পরসঙ্গ
বুঝি করব জেনহ কাজ ভঙ্গ।
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন বেগয়
রাধারতন জৈসে তুয় হোয়।।

কবি শুধু রাধার দেহের পরিবর্তন চিত্রটি অঙ্কন করে, সেই দেহে মদন দেবের আধিপত্য বিস্তারের কথা বলেই থেমে গেলেন না। পাশাপাশি বাধার মনোজগতের যে পরিবর্তন সূচিত হল যৌবনাগমনে তার সূক্ষ্ম বর্ণনাটিও উপস্থাপন করেছেন

চিত্রাত্মক পদ্ধতিতে—

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পদ দুহু লোচন লেল।
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করল পরগাস।।
মুকুর লই অব করত সিঙ্গার।
সখী পুছই কৈসে সুরত বিহার।।
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসইত অপন পয়োধর হেরি।।
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগরোল অঙ্গ
মাধব পেখল অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা।।
বিদ্যাপতি কহ তুহু আগোয়ানি।
দুহু একযোগ ইহাকে কহ সযনি।

বিদ্যাপতির রাধা সম্পর্কে একটি অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি রাধাকে দেহদীপ্তিময়ী রমণী হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। তাঁর পদে আদিরসের ছড়াছড়ি রয়েছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদ আলোচনাকালে এ সত্য ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রথমত তিনি ছিলেন চৈতন্য পূর্ববর্তী, দ্বিতীয়ত যুগটি ছিল আদিরসকে আবাহনের, তৃতীয়ত বিদ্যাপতি কাব্যচর্চার জন্য পদরচনা করেছেন, চতুর্থত, পদ রচনার পেছনে কবির সৌন্দর্য অনুধ্যানটি ছিলো বিশেষ সক্রিয়। এ জন্যই আমরা বিদ্যাপতির রাধার দেহের অংশ বেশী দেখি।

যৌবনের আগমনে রাধার দেহমনে এক গভীর পরিবর্তন সূচিত হল। অপূর্ব সুন্দর তনুদেহখানি তার নিজেরই দৃষ্টিতে আশ্চর্যের বিষয় হয়ে ওঠে। কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে নিজেকেই দেখতে থাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তার মনে উদয় হয় প্রেমভাব। সঙ্গম সুখ কামনাও হয়ে উঠতে থাকে প্রবল। কৃষ্ণপ্রেমে রাধা হয়ে ওঠে আত্মহারা। এই প্রেমময়ী রাধার মনস্তত্ত্বটি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের চাঞ্চল্যে সে তীব্র বেগে ধাবিত হয় কৃষ্ণের প্রতি আবার যুবতীসুলভ লজ্জা কৃষ্ণমিলনে সৃষ্টি করে প্রবল বাধা। তবে কৃষ্ণের সঙ্গে সুতীব্রমিলন আকাঙ্ক্ষাটি রাধা চরিত্রে হয়ে উঠে প্রবল। তাই ভীরু সলজ্জ রাধাকে সুতীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা অভিসারের পথে করে অগ্রসর। অভিসারের পদ রচনায়

বিদ্যাপতি বেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। রাধা সলজ্জ কিন্তু অধীরা; কৃষ্ণ মিলনাকাঙ্ক্ষায় কোনো বাধাই সে মানতে রাজি নয়। পথ যত দুর্গমই হোক, সময় যত প্রতিকূলই হোক, পারিপার্শ্বিকতা যত বিরুদ্ধগামীই হোক সব কিছুকে অতিক্রম করে সে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবেই। এই দৃঢ়চেতা রাধার চিত্রাঙ্কনে কবির অসাধারণত্ব নিম্নের উদ্ধৃত পদটি লক্ষ্য করলেই প্রমাণিত হবে :

বয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খনে আওব কুঞ্জর-গমনী।।
ভীম ভুজঙ্গম সরনা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা।।
বিহি পায়ে করো পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার।।
গগনে সঘন মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা।।
দশ দিশ ঘন আঁধিয়ার।
চলইতে খলই লখই নাহি পার।।
সব জনি পলটি ভুললি।
আওত মানবি ভানত লোলি।।

রাধার এই যে, দুর্গমতাকে অতিক্রম করে প্রিয়সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস এর মধ্যে হয়ত বা দৈহিক মিলন-আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। তবুও এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, এর মধ্য দিয়ে বিদ্যাপতি ঈশ্বরসাধনার দুরূহতার ইঙ্গিতটিও দিয়েছেন।

সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন ঘটে। কৃষ্ণের প্রেমালিঙ্গনে আত্মহারা রাধা সমস্ত লজ্জা, ভয়-ভীতিকে ভুলে গিয়ে মিলনের সুখকে সুতীব্র করতে চায় নানা মাত্রায়, নানা প্রক্রিয়ায়। কিন্তু মিলনের আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না। পরিপূর্ণ উপভোগের আগেই আসে বিচ্ছেদ। শুরু হয় বিরহ। এই বিরহ দশায়ই আসে রাধা চরিত্রের সম্পূর্ণতা। ইতিপূর্বে রাধার ভালোবাসায় দৈহিক মিলনের একটি স্বার্থ ছিল বিজড়িত। কিন্তু এখন সেই স্থান অধিকার করেছে গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা। বিরহের পদ সৃষ্টিতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। দুঃখ সম্পর্কে গৌতমবুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরা কতগুলো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন দুঃখ বা বেদনা থাকে বলে তা ত্রিবিধ— সুখবেদনা, দুঃখবেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ বেদনা। বিশ্লেষণ করে তাঁরা

বলেছেন যে, কায়িক এবং মানসিক অনুসারে এই বেদনার মধ্যে আমরা সুখকে পাই, দুঃখকে পাই, বিপাক চিত্তকে পাই, উপেক্ষাকে পাই, স্মারককে পাই, এভাবেই তাঁরা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে মানবচিত্তের শ্রেণীবিভাগও করেছেন। তবে এ সমস্ত শ্রেণীভাগে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন শুধু সুখ এবং দুঃখকে এবং এ দু'য়ের উপর নির্ভর করে সুখবেদনা এবং দুঃখবেদনাকে। বৌদ্ধধর্মে তত্ত্বের নানাবিধ জটিল তাৎপর্য উপস্থিত করা হয়েছে, সে তাৎপর্যের মধ্যে না গিয়ে আমরা শুধু সুখ বেদনা এবং দুঃখবেদনার কথা আমাদের বিচারে আনতে পারি।

ইংল্যান্ডে রোম্যান্টিক কাব্যধারার সূত্রপাতে আমরা মহান কবি শেক্সপীয়রের দুঃখ এবং বেদনার সহ্যশক্তির পরীক্ষা দেখেছি। সেখানে অশেষ দুঃখকে মানবজীবনের পরিচয় সূত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শেক্সপীয়র বলছেন এ পৃথিবীতে আমাদের আগমনকে আমরা যেমন সহ্য করি তেমনি আমাদের তিরোধানকেও সহ্য করি। মূলতঃ পরিপূর্ণতাই হচ্ছে মানবজীবনের একমাত্র কাম্য। কিংলীয়র নাটকটি একটি দুঃখযন্ত্রণা ভারাক্রান্ত নাটক। লীয়র অসৌজন্য সহ্য করেছেন, অবহেলা সহ্য করেছেন, নির্মম নিষ্পেষণ সহ্য করেছেন, এবং অশেষবিধ দুঃখ সহ্য করেছেন। এই সহ্য করার মধ্য দিয়েই তার ত্রাণ ঘটেছে। রোম্যান্টিক যুগে আমরা লক্ষ্য করি মানুষ দুর্গম পথ পার হচ্ছে ঐশ্বর্য সন্ধানের জন্য; অশেষ দুঃখ সহ্য করে অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা করছে, এই চেষ্টাকে রোম্যান্টিক চেতনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই রোম্যান্টিক চেতনার মধ্যে বেদনাবৃত্তিটি অত্যন্ত প্রবল। সুখকে রোম্যান্টিক কবিরা কখনও আমন্ত্রণ জানাননি বরঞ্চ বেদনার দাহনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম একটা তৃপ্তি তাকেই তাঁরা কাম্য ভেবেছেন। শেক্সপীয়রের সামসময়িক কবি এবং নাট্যকার মার্লোর মধ্যে এই পরিচয়টি পাই। মার্লোর নাটকগুলো বিয়োগান্ত এবং সেখানে বিয়োগবেদনার মধ্যেই শান্তি। তাঁর *ফাউস্টাস* নাটকের কথা চিন্তা করা যাক, নাটকটিতে অসম্ভবকে পাবার একটি প্রবল বাসনার পরিণতিকে দেখানো হয়েছে। ড: ফাউস্টাস শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করলেন পৃথিবীর সকল আনন্দকে উপভোগ করবার জন্য। কিন্তু আনন্দ যে বেদনা আনে তা' তিনি জানতেন না। তিনি সুন্দরী হেলেনকে পেলেন, তাকে চুম্বনও করলেন কিন্তু চিরকালের জন্য ধরে রাখতে পারলেন না; অর্থাৎ চরম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চরম অপ্রাপ্তির যন্ত্রণার সূত্রপাত হলো। মার্লো তাঁর নাটকের মধ্যে বেদনার নির্মম দাহনের একটি বিস্ময়কর চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। মহৎ ব্যক্তিরা নিশ্চিন্তকে চায় না, নির্ভাবনাকে চায়না, তারা

বেদনার দাহনকে চায়, কেননা এই দাহনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে মানুষের মুক্তি সম্ভব।

ইংল্যান্ডের ইংরেজী কাব্যে রোম্যান্টিক কাব্যের রিভাইবাল বা পুনরাবির্ভাব ঘটল শেলী এবং কীটস এর আমলে। এ দু'জন কবি বেদনার একটি চিত্তগত অহমিকা এবং আস্বাদন নির্মাণ করেছিলেন, কীট্স এর একটি কবিতা আছে, কবিতাটির নাম *ওড টু মেলানকলি* অর্থাৎ বেদনার প্রতি স্তোত্র। এই কবিতাটিতে কীট্স সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, তোমার চিত্তে যদি কোনো কারণে বেদনার উদয় হয় তবে সে বেদনাকে ভুলে যাবার চেষ্টা কর না। বরঞ্চ সে বেদনাকে চিত্তে লালন করতে থাকো; বেদনা বিস্মৃতিতে আনন্দ নেই, বেদনার উজ্জীবনেই আনন্দ। সুতরাং বেদনাকে একটি সম্ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা বেদনাই হচ্ছে মুক্তি এবং বেদনাই হচ্ছে সান্ত্বনা। কীট্স এর এই উপলব্ধিতে আমরা বেদনাকে একটি বিশেষরূপে উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধিকেই রোম্যান্টিক উপলব্ধি বলা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে এই রোম্যান্টিকতার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কাব্যে। তাঁরা সরাসরি পাশ্চাত্য রোম্যান্টিকতা দ্বারা অবিভূত হয়ে বাংলা কবিতায় একটা নতুন রসাবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু এরও অনেক পূর্বে কোনরূপ বিদেশী প্রভাব ছাড়াই নিজস্ব অনুভূতিতে বেদনাবৃত্তি নির্মাণ বিদ্যাপতি করেছিলেন। বিদ্যাপতির কাব্যের মধ্যে আমরা এক প্রকার দুঃখবোধকে নির্মিত হতে দেখি। এবং দুঃখকে লালন করে দুঃখ সহ্য করবার প্রয়াস লক্ষ্য করি। প্রেমের ক্ষেত্রে দুঃখবোধ প্রেমকে তাৎপর্যবহ করে, যে প্রেমে দুঃখ নেই সে প্রেম নিরুত্তাপ এবং অর্থহীন, বিদ্যাপতি কোনো প্রকার নিরুত্তাপ প্রেমের যাঞ্চা করেননি। তিনি এমন একটি দুঃখবিলাস নির্মাণ করেছিলেন যা' প্রেমের একটি গভীরতার ব্যঞ্জনা দেয়। তিনি তাঁর কবিতায় বলছেন 'হে সখি আমার দুঃখের অন্তঃ নেই।' কেন এ দুঃখ তিনি তা' বলছেন না, তাঁর যে দুঃখের পরিসীমা নেই তাই তিনি বলতে চাচ্ছেন। চরম প্রাপ্তিকালে হারিয়ে ফেলবার যে বেদনা সে বেদনাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাপ্তি'র একটি বৈকুণ্ঠ আছে, অপ্রাপ্তি বেদনারও একটি বৈকুণ্ঠ আছে। বিদ্যাপতি বলছেন যে নানাভাবে দেব আরাধনা করেও তিনি আশ্বাস পাচ্ছেন না এবং বেদনার ভার থেকে মুক্ত হচ্ছেন না। তাঁর বেদনা এমন অসীম যে, নিছক বেদনার কল্পনাই তাঁকে মর্মাহত করছে। এই বেদনাবৃত্তির মধ্য দিয়েই আমাদের কাব্যে একটি রোম্যান্টিকতা নির্মিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কিন্তু

বেদনার কাহিনী। প্রথমে একটি প্রাপ্তির ইচ্ছার জন্ম, ক্রমশঃ পাবার আকাঙক্ষার প্রবলতা সৃষ্টি, তারপর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তি মুহূর্তে হারাবার সম্ভাবনা চিন্তা, অবশেষে সত্যিকারভাবে হারিয়ে ফেলা, এই ধারাক্রমের মধ্যে কৃষ্ণলীলা আবর্তিত হয়েছে। এই লীলার ব্যঞ্জনার বেদনা বা দুঃখটাই প্রবল, বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাস উভয়ে কিন্তু বেদনার কবি। উল্লাসের পথ তাঁদের কাব্যে যতটা, অনুপম বেদনার রসাবেশ তার চেয়ে অনেক বেশী।

কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার মধ্য দিয়ে রাধার শুরু হয় বিরহদশা। কৃষ্ণহীন গোকুল এখন রাধার কাছে শূন্য, ঘন অন্ধকারময় গোকুলে এখন শুধু নয়ন জলের ধারা বইছে কৃষ্ণ বিরহে। মিলন মন্দির শূন্য, শূন্য নগরী, শূন্য দশদিক। যমুনা তীরেও রাধার যেতে ইচ্ছে করছে না; সেখানে তার জন্য এখন কোনো সুখ অপেক্ষা করে নেই; রয়েছে কেবল অন্তহীন শূন্যতা, বেদনা, কষ্ট, হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা :

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল।।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি।।
কৈছনে যায়ব যমুনা তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর।।

অথচ প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের সুখকে চরমভাবে উপভোগের জন্য রাধা বক্ষে বস্ত্র, হার পরত না। সেই প্রিয়তম আজ নদী ও পাহাড়ের ব্যবধানে গিয়েছে। যার গর্বে সে অনেককে তুচ্ছ জ্ঞান করতো, আজ তার অনুপস্থিতিতে অনেকেই অনেক কথা বলছে। তাই রাধা আক্ষেপ করে দুঃখের সঙ্গে বলছে—

চীর চন্দন হার উরে না দেলা।
সো অব নদী–গিরি আঁতর ভেলা।।
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কিনা কহলা।।
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে।।
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।

পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে।।
আন অনুরাগে পিয়া আন দশে গেলা।।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।।

কালান্তরে রাধার বিরহ-বেদনা তীব্রতর হয়ে উঠে। বর্ষাকালের আকাশের দিকে চাইলে সুখীজনের চিত্তেও বেদনার সুর অনুরণিত হয়। মন উদাসীন হয়ে উঠে। রোম্যান্টিক বেদনার সৃষ্টি করে। এমনি পরিপূর্ণ বর্ষাকালে রাধা একাকী প্রিয়হীন অবস্থায় শূন্য মন্দিরে অবস্থান করছে। ফলে প্রিয়-বিরহের বেদনা হয়ে উঠে প্রকটতর। তার উপর পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত রাধার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বহু গুণে:

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহকী
ফাটিয়া যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজু রিক পাঁতিয়া।

দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, বিহর, যন্ত্রণার রক্তাক্ত পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে রাধা যেন ক্রমেই অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগল, অন্য কোন জগতের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেতে চাইল। এখন আর সে চঞ্চলা কিশোরী নয়। তার মধ্যে এখন আর সহজ উচ্ছলতা নেই। অল্পেই অস্থির হয়ে উঠে না। এখন সে 'প্রেম প্রৌঢ় নায়িকা।' কৃষ্ণবিরহে করুণ আর্তি আছে কিন্তু সেখানে দেহসম্ভোগের বাসনা নেই, নেই ইন্দ্রিয়সুখের তীব্র বাসনা, আছে শুধু সুগভীর অন্তরবেদনার চিত্র, আছে নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ ভালোবাসা। রয়েছে 'বিরহানলে দগ্ধ' হয়ে, 'বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ তপস্যার' পথ পেরিয়ে প্রিয়তমকে অন্তর্লোকে চিরস্থায়ীরূপে পাবার প্রয়াস।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন রাধা পেল মানস বৃন্দাবনে। এখন আর তার কোন বিরহ বেদনা নেই, অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, নেই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। কামদেবের শরকেও এখন সে ভয় করে না। তার উত্তরণ ঘটেছে এক জ্যোতির্ময় চেতনাস্তরে।

আজু রজনী হম　　ভাগে গমাওল
পেখল পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন　　সফর করি মানল
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।।
আজু মঝু গেহ　　গেহ করি মানল
আজু মজু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি　মোহে　　অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহি সন্দেহা।।
সোই কোকিল　　অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব　　লাখবাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা।।
অব বঝু যব　　পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।।

শুধু তাই নয় যে, রাধা এক সময় উচ্চারণ করেছিল 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর,' সে রাধাই এখন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করছে—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।
পাপ সুধাসর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।
শীতের উড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।

বিদ্যাপতি ভাবসম্মিলনের এই পদে রাধার যে উক্তি তুলে ধরেছেন তা যে অপার্থিব

তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মনে হয় এ রচনা যেন চৈতন্যোত্তর-কালেরকোনো পদকর্তার। কিন্তু এটি বিদ্যাপতিরই পদ। এবং এ-ধরনের আরো পদ রয়েছে। বিদ্যাপতি ছিলেন কালোত্তীর্ণ প্রতিভা। আর এ জন্যই তিনি সাধক না–হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পদে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয়েছে অনায়াসে। লৌকিক জগতের কামনা হয়ে উঠেছে অলৌকিক জগতের।

বিদ্যাপতির কৃষ্ণ

সাহিত্যে গোপী-কৃষ্ণের শৃঙ্গারিক সম্পর্কের উল্লেখ সর্বপ্রথম অশ্ব ঘোষের *বুদ্ধচরিতেএ* পাওয়া যায়। *বুদ্ধচরিত* খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ। এই প্রথম শতাব্দীতেই সঙ্কলিত গাথা সপ্তশতীতে রাধাকৃষ্ণ তথা গোপীদের শৃঙ্গার বিষয়ক অনেক গাথা আমরা পাই। দক্ষিণ ভারতে আলোয়ারে কৃষ্ণভক্তির সাহিত্যের মধ্যে গোপী-কৃষ্ণ প্রসঙ্গে অনেক গীত পাওয়া যায়। পুরাণ সাহিত্যের অতিরিক্ত পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে গোপী-কৃষ্ণের উদ্দাম শৃঙ্গার কেলী বর্ণিত হয়েছে। এবং সেখানে কৃষ্ণের চরিত্রের মধ্যে লালিত্য এবং মাধুর্যের সঙ্গে দেবত্বের বিকাশ ঘটেছে। *গাথা সপ্তশতীতে* গোপী-কৃষ্ণের মধুর লীলার মধ্যে দেবত্বের বিকাশ নেই। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ শতকে এসে আমরা কৃষ্ণের দেব রূপের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এ-সময়কার কিছু কৃষ্ণভক্তি কাব্যে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লীলাশুক এর রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* কাব্যে, ঈশ্বরপুরীর *শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত* কাব্যে, এবং জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যে। এ সময় কৃষ্ণকে নিয়ে আরো কিছু কাব্য রচিত হয়েছে— যেমন : *হরিলীলা,* ব্রজবিহারী *গোপলীলা, হরিচরিত কাব্য,* এবং *মুরারি বিজয়* কাব্য। কৃষ্ণের বিষয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক সামগ্রী আমরা পাই, সেগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন অবশ্য সে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের আনন্দ এবং মাধুর্য তার মধ্যে ছিল, ক্রমশ কৃষ্ণের সেই মাধুর্য প্রেমমার্গী কাব্য ধারায় পরিণত হয়। বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে কখনো বিবেচনা করেননি। তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎরূপ বলে গ্রহণ করেছেন। এবং প্রেমের বিগ্রহ হিসাবে স্বীকার করেছেন। সেই কারণে বৈষ্ণব কাব্যে তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রণতি এবং সমর্পণের ভাব সম্মিলিত হয়েছে। বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের শৃঙ্গারিক রূপের একটা অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অর্থ দান করেছেন।

কৃষ্ণভক্তির ধারা কালান্তরে মাধুর্য রসে ওতোপ্রোত হয়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। যেমন বল্লভ সম্প্রদায়, রাধা-বল্লভ সম্প্রদায়, চৈতন্য

সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়। এই মাধুর্যের লীলাভাষ্য কাব্যে সর্বপ্রথম যিনি প্রচারিত করেন তিনি হচ্ছেন বিদ্যাপতি। তাঁর পদাবলীতে আমরা এই লীলা প্রত্যক্ষ করি। বিদ্যাপতির উপর তাঁর সামসময়িক দরবারী জীবনের প্রভাব যেমন পড়েছিল তেমনি প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন সময়ের শৃঙ্গারিক ভাবনার প্রভাব। যে শৃঙ্গারিক ভাবনা বিদ্যাপতির সময় প্রচলিত ছিল দক্ষ শিল্পীর তাৎপর্যময় ভাষায় তিনি তাকে বাসনার নিম্ন পর্যায় থেকে তুলে আনেন। এবং মাধুর্যের সাধনায় চিত্রিত করেন। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে মদনদেবের উদাহরণ পাই। মদন হচ্ছেন কামদেব। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই মদনদেবের রতি শৃঙ্গারকেও টেনে আনা হয়েছে। পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে, কৃষ্ণগায়ত্রী এবং কামগায়ত্রীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শিবের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা ভস্মীভূত কামদেব অনঙ্গরূপে আরো প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এভাবেই কৃষ্ণসাধনা অংশত অনঙ্গসাধনা আবার মাধুর্যসাধনা। বিদ্যাপতি তাঁর অনেক পদে কাম পূজার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন; যেমন 'দাম চম্পক কাম পূজল', 'কইসে কৈ হাম ময়ণ অরাধব', 'সাধলি মনমথ তন্ত'। এই মন্মথতন্ত্রের কথা বিদ্যাপতি বহুবার বলেছেন।

বিদ্যাপতির কাব্যে জগৎবিজেতা নৃপতি কামদেবের প্রশংসা আছে এবং তার ঐশ্বর্য ও শক্তির সম্মোহন আছে। বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদে বর্ণিত কামের উল্লেখ মঙ্গলময় হিসাবে দেখা হয় যার স্পর্শে জড় এবং চেতনের মধ্যে নতুন স্ফূর্তি জাগে। বিদ্যাপতি লৌকিক মদনকে নিরন্তর কৃষ্ণের রূপ রসরঙ্গ প্রেম এবং মাধুর্যের দ্বারা পরাজিত দেখিয়েছেন।

বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'

বিদ্যাপতি ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে অবহট্‌ঠ ভাষায় *কীর্তিলতা* রচনা করেছিলেন। এরও আগে ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর অবহট্‌ঠ ভাষায় *বর্ণরত্নাকর* রচনা করেছিলেন। সৌরসেনী অপভ্রংশের পরবর্তী রূপ হচ্ছে অবহট্‌ঠ। কিন্তু এ অবহট্‌ঠ ভাষা কবে প্রথম প্রচলিত ছিল তা ঠিক জানা যায় না। দ্বাদশ শতকের কবি আব্দুর রহমান তাঁর *সন্দেশরাসক* কাব্যে তিনটি ভাষার উল্লেখ করেছেন, এ তিনটি ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অবহট্‌ঠ। জ্যোতিরীশ্বর এবং বিদ্যাপতিও সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরে অবহট্‌ঠের উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ষট ভাষা প্রসঙ্গে সংস্কৃত, প্রাকৃত, সৌরসেনী,মাগধী, পৈশাচী এবং দেশী নামক কয়েকটি ভাষার উল্লেখ করেছেন। এদের উল্লেখের মধ্যে সৌরসেনী অর্থে অপভ্রংশের উল্লেখ আছে কিন্তু অবহট্‌ঠের উল্লেখ নেই। *প্রাকৃত পৈঙ্গল-এ* প্রথমা

ভাষা হিসাবে অবহট্‌ঠের কথা উল্লেখ আছে।তবে যাই হোক, আমরা চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে উত্তর ভারতের ভাষা–স্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ছয় প্রকার ভাষার অনুমান করতে পারি :

১. সংস্কৃত–প্রাকৃত— সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে এ দুটোই গ্রাহ্য ছিল: বুদ্ধি বিকাশের প্রকাশ হিসেবে কাব্য প্রণয়নের ভাষা হিসেবে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয় ভাষাই মর্যাদার আসনে ছিল।

২. সৌরসেনী অপভ্রংশের সাহিত্যিক রূপ— জৈন সাধকদের আদর্শ হিসেবে এ–ভাষা তাদের রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। শালীভদ্র সুরি এবং লক্ষ্মণ নামক দু'জন জৈন লেখকের রচনায় এ–ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. সৌরসেনীর পরবর্তী অবহট্‌ঠ রূপ— সিদ্ধাদের দোহা, বিদ্যাপতির *কীর্তিলতা* এবং আবদুর রহমানের *সন্দেশরাসক*–এ এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. অবট্‌ঠ এবং রাজস্থানী ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন পিঙ্গল— *প্রাকৃত পৈঙ্গল*, প্রাচীন *রাসোকাব্য*, রণমল্লছন্দ এ–ভাষায় রচিত হয়েছে। এ–ভাষা ছিল চারণ কবিদের ভাষা।

৫. পশ্চিমী প্রাচীন রাজস্থানী অথবা গুজরাটি মিশ্রিত অপভ্রংশ— পণ্ডিত শিব-প্রসাদ সিংহ তাঁর *বিদ্যাপতি* গ্রন্থে এ–ভাষাকে একটি সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ–ভাষার বর্ণনা দেননি।

৬. দেশ অপভ্রংশ থেকে বিকশিত জনভাষা: প্রারম্ভিক মৈথিলী, রাজস্থানী এবং গুজরাটি।

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা মূলত এই সর্বশেষ জনভাষা। তবে এ–ভাষার উপর অবহট্‌ঠ এবং রাজস্থানীর প্রভাব রয়েছে।

বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় *কীর্তিলতা*, *কীর্তিপতাকা*, এবং আরো কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেছিলেন। *কীর্তিলতা'র* সর্বপ্রথম সংস্করণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বাংলা ১৩৩১ সালে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে *কীর্তিলতা-র* প্রতিলিপি নিয়ে আসেন। প্রথম সংস্করণ হওয়ার কারণে পাঠের অর্থনির্ণয়ে কিছু ভ্রান্তি ঘটেছিল। ১৯২৯ সালে কাশীর নাগরী প্রচারণী সভায় বাবুরাম সাকসেনার সম্পাদনায় *কীর্তিলতার* একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ সংস্করণও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না। অবশেষে ১৯৪৪ সালে ড. শিবপ্রসাদ সিংহ বিস্তৃত বিশ্লেষণসহ সাহিত্য-ভবন লিমিটেড, প্রয়াগ থেকে *কীর্তিলতা'র* একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। *কীর্তিলতা'র* যথার্থ কাব্যগত মূল্যায়ন এ পর্যন্ত হয়নি। যেটা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কীর্তিলতা এবং *কীর্তিপতাকা* ছাড়া অবহট্‌ঠ ভাষায় বিদ্যাপতির আরো দু'তিনটি রচনা আছে। কিন্তু এ সমস্ত রচনার সাহিত্যিক মূল্য নেই বললেই হয়।

কীর্তিলতার ভাষা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে বিদ্যাপতি এ-কাব্য রচনা করেছিলেন। এ-সম্পর্কে ড. শিবপ্রসাদ সিংহের মন্তব্য হচ্ছে : " 'কীর্তিলতার' শব্দগত কাঠিন্য অতিক্রম করে এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারলে সহৃদয় পাঠক আনন্দ পাবেন। কীর্তিলতার পাঠক কীর্তিলতায় এক নতুন রসের আস্বাদ পাবেন। এই কাব্যে জীবনের তিক্ততা এবং মিষ্টতা উভয় স্বাদই আছে। জীবনে কঠোরতা আছে এবং ক্রূরতা আছে। এই কঠোরতা ক্রূরতার অভিব্যক্তিও আমরা কীর্তিলতায় দেখতে পাই। শংকরের মস্তিষ্কের উপর সুশোভিত দ্বিতীয় চন্দ্রমার মতো বিদ্যাপতির এ-কৃতি অবশ্যই প্রশংসিত হবে।"

মধ্যযুগের কাব্যের বৃত্তান্ত-কথনের ক্ষেত্রে তিন প্রকার শৈলী লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথম হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ভূত চরিতকাব্য বা ঐতিহাসিক কাব্যের শৈলী। দ্বিতীয়ত কথা-আখ্যায়িকার শৈলী। এবং তৃতীয়ত প্রেমাখ্যানগত মসনবী কাব্যের শৈলী। এই তৃতীয় শৈলীটি পারসিক প্রভাবে বিকশিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্যের শৈলী খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটার ফলে এদেশে ঐতিহাসিক কাব্য লিখিত হওয়া শুরু হয়। এ-ধরনের কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস বলতে বুঝতো, ইতিহাসগত কল্পনা কিংবা অতিশয়োক্তির আবরণে গৃহীত বিভিন্ন উপকরণ। এ-গুলোর সাহায্যে যে কাব্য গড়ে উঠত তার মধ্য থেকে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আধুনিক কালে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি সে সময় সেই ইতিহাসচেতনা মানুষের ছিল না। সে সময়কার কাব্যে ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তিকে পৌরাণিক অথবা কাল্পনিক কথানায়ক বানাবার প্রবৃত্তি ছিল। যুদ্ধ-বর্ণনায় দৈবী শক্তির আরোপ করা হত। যেমন রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ এদের জীবন কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কাল্পনিক অনেক ঘটনার বিবরণ তৈরি করা হয়েছে। বস্তুত এতিহাসিক কাব্যের উদয় হয়েছে সামন্তবাদ থেকে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে রাজস্তুতি-বিষয়ক রচনার শুরু হয়। ম্যাক্সমুলার খ্রীষ্টিয় প্রথম থেকে খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলেছেন। কেননা এই শতাব্দীকালে যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনার অভাব দেখা যায়। তবে ম্যাক্সমুলারের মতের বিরুদ্ধতা করে ড. ব্যুলার বলেছেন, এটা সত্য নয়, কেননা এ সময় যথেষ্ট সুন্দর স্তুতিকাব্য রচিত হয়েছে। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের প্রশস্তি প্রাচীন শিলালেখ-এ পাওয়া যায়। এ-লেখগুলিতে সমুদ্র গুপ্তের দিক্‌বিজয়ের বর্ণনা আছে। এ-দিকবিজয়ের বর্ণনা ভাব-ভাষার দিক থেকে অত্যন্ত সুন্দর। তবে বলা যেতে পারে বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত থেকেই মূলত

এতিহাসিক কাব্যের সূচনা। *হর্ষচরিত* ব্যাপক অর্থে একটি কাব্য নয় এটা একটি আখ্যায়িকা। কবি বিলহন রচিত *বিক্রমাঙ্কদেব চরিত* একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক কাব্য। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে কহ্লন রচিত *রাজতরঙ্গিনী,* ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হেমচন্দ্রের *কুমার পাল চরিত* এবং পাল রাজত্বকালে সোমেশ্বরের *কীর্তি-কৌমুদী* এগুলো উল্লেখযোগ্য কাব্য।

সংস্কৃত এই ঐতিহাসিক কাব্যের পরম্পরা অল্প কিছু পরিবর্তিত রূপে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশেও দেখা যায়। *কীর্তিলতাও* এক অর্থে ঐতিহাসিক কাব্য। কবি বিদ্যাপতি আপন আশ্রয়দাতা কীর্তিসিংহের কীর্তিকে উজ্জ্বল করবার জন্য এই কাব্য রচনা করেছিলেন। সে অর্থে এটি একটি চরিতকাব্য :

রায়রচিত রসালু য়হ
ণাইন রাখহি গোই
কবন বংসকো রায় সো
কীর্তিসিংহ কো হোই।

ভৃঙ্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে ভৃঙ্গ ক্রমশ কীর্তিসিংহের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে থাকে। *কীর্তিলতা* একটি ক্ষুদ্র রচনা। সেজন্য এর মধ্যে চরিতকাব্যের সকল প্রকার প্রবৃত্তি খুঁজে পাওয়া যাবেনা। *কীর্তিলতা* একটি সংবাদ-পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। ভৃঙ্গী শংকা প্রকাশ করছে এবং ভৃঙ্গ তার উত্তর দিচ্ছে। রাসকাব্যে শুক-সারীর সংবাদের মত *কীর্তিলতাও* সংবাদ-কাব্য। কিন্তু এখানে রাসকাব্যের বিস্তার নেই। এখানে দেখতে পাই যে ভৃঙ্গ এবং ভৃঙ্গী বক্তা এবং শ্রোতারূপে বিদ্যমান রয়েছে শুকসারীর মত নায়কের আপদ-বিপদে ছুটে যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত পদ্ধতি অনুকরণ করেও বিদ্যাপতি এখানে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। মধ্যকালীন চরিতকাব্যের মধ্যে *কীর্তিলতা* বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, এ কারণে এখানে লেখক কল্পনা ও অতিরঞ্জনকে কম ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাতথ্যতা বিষয়ে বিদ্যাপতি যতটা সতর্ক ছিলেন ততটা সতর্ক সমকালীন অন্য কোন কবি ছিলেন না। *কীর্তিলতায়* নায়কের যুদ্ধ-বীরত্বের বর্ণনা আছে কিন্তু সেখানে অস্বাভাবিক ঘটনার খুব সমাবেশ তিনি ঘটাননি। শুধুমাত্র পাঠককে তৃপ্তি প্রদানের জন্য, কথা-রস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অবান্তর ঘটনা, প্রেমবৈকল্য এবং ভূত-পরীদের বিবরণ বিদ্যাপতি আনেননি। চরিতকাব্যের মত এই কাব্যের আরম্ভে সজ্জন প্রশংসা এবং খলনিন্দারও কিছু পংক্তি আছে :

সুঅণ পসংসাই কব্ব মঝু
দুজ্জন বোলই মন্দ
অবসও বিসহর বিস বমই
অমিঅ বিমুক্কই চন্দ।

এর অর্থ হচ্ছে, সজ্জন পুরুষ অমৃততুল্য যে অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু ফল হচ্ছে বিষধর। তার কাজ বিষ-বমন করা, কিন্তু

বালচন্দ বিদ্যাবই ভাসা
দুহু নহি লগগহ দুজ্জন হাসা
ও পরমেসর হর সির সোহই
ঈ নিচ্চই না অর মন সোহই।

আপন প্রতিমার উপর কবির অটুট বিশ্বাস রয়েছে। তিনি জানেন যে, দ্বিতীয়ার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার উপর দুর্জনের উপহাস কার্যকর হয়না। সে উপহাস শংকরের মস্তকের উপর সুশোভিত হয়।

কীর্তিলতায় খলনিন্দা এবং সজ্জন-প্রশংসা পরিপাটি রূপে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যে যুদ্ধের উদ্‌যোগের বর্ণনা আছে। *কীর্তিপতাকায়* প্রেমের বর্ণনা আছে। *কীর্তিপতাকায়* যুদ্ধের ভূমিকা নেই, শান্তির ভূমিকা আছে। *কীর্তিলতায়* বিদ্যাপতি বলেছেন যে আমি সেই পুরুষের কাহিনী বর্ণনা করছি যে কাহিনীর প্রস্তাবে পুণ্য হয়, সুখ হয় এবং শুভ-বচন ও স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়। লেখক শুধু কাহিনীই বর্ণনা করেননি বরঞ্চ আখ্যায়িকার শেষে বলছেন যে এ-কাহিনী যে শুনবে তার অনেক উপকার হবে। *কীর্তিলতায়* শুধু পদ্য ব্যবহার হয়নি, গদ্য-পদ্য উভয়েরই প্রয়োগ ঘটেছে। শুধু কাব্যাংশ নয় গদ্য খণ্ডকেও বিদ্যাপতি সরস এবং অলঙ্কৃত করবার প্রযত্ন করেছেন। সাধারণত কথাকাব্যের মধ্যে রাজ্যলাভ, কন্যা-হরণ, গন্ধর্ববিবাহ এগুলো থাকে। কিন্তু *কীর্তিলতায়* কেবল রাজ্যলাভের বৃত্তান্ত আছে। হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী *কীর্তিলতাকে* কথাকাব্য না বলে 'কহানী কাব্য' বলেছেন। বাঙালি পাঠকের জন্য এ-কথাটির ব্যাখ্যা দরকার। কথা কাব্য—যেখানে প্রচুর অলঙ্কার থাকে,কল্পনার বিস্তার থাকে, যুদ্ধের উদ্‌যোগ থাকে, যুদ্ধ থাকে, রাজ্যলাভ থাকে, প্রেম-নিবন্ধ থাকে, কন্যা-হরণ থাকে এবং গন্ধর্ব বিবাহ-আদি থাকে। কিন্তু 'কহানী' হচ্ছে যেখানে শুধুমাত্র আখ্যায়িকা বর্ণনা করা হয়। *কীর্তিলতায়* অবশ্য কথাকাব্যের কিছু বিশিষ্টতা বিদ্যমান আছে। একেবারে যে নেই তা নয়। যেমন সেখানে নগর-বর্ণনা,যুদ্ধ-বর্ণনাপ্রসঙ্গআছে।

কীর্তিলতা কাব্য কীর্তিসিংহের জীবনের একাংশ নিয়ে লেখা অর্থাৎ কীর্তি সিংহের যুদ্ধ ও রাজ্যলাভ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা। লক্ষণ সম্বৎ ২৫২ অর্থাৎ ইংরেজী

১৩৭১ সালের কাছাকাছি সময়ে মালিক আসলাম তিরহুতের রাজা গনেশ্বরকে বধ করেন। গনেশ্বরের মৃত্যুতে তিরহুতে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। এই অরাজকতা বিষয়ে একটি বিস্তৃত চিত্রণ বিদ্যাপতি তাঁর *কীর্তিলতায়* উপস্থিত করেছেন। বিস্তৃত বর্ণনার পর কাহিনী বিন্যাসে বিদ্যাপতি বলছেন যে, রাজা গনেশ্বরকে হত্যা করে অর্সালানের পরিতাপ হল। সে সিদ্ধান্ত নিল যে গনেশ্বরের রাজ্য তার পুত্রের কাছে সে প্রত্যার্পণ করবে। কিন্তু কীর্তি সিংহ পিতার হত্যাকারীর কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে স্বীকার করল না। সে তার ভ্রাতা বীরসিংহকে সঙ্গে নিয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম খাঁর কাছে উপস্থিত হল। পথে অনেক বিপদ ছিল। সে সব অতিক্রম করে তারা জৌনপুরে উপস্থিত হল। বিদ্যাপতি এখানে জৌনপুরের একটি অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনায় জৌনপুর ছিল লক্ষীর বিশ্রামস্থান এবং নয়নের আনন্দ। জৌনপুরের উদ্যান, বাসগৃহ, রাজপথ, পুষ্করিনী, সোপান এবং হাজার হাজার স্বর্ণকলসযুক্ত শিবালয়ের বিশদ বর্ণনা কবি দিয়েছেন। তিনি ওখানেই ক্ষান্ত হননি, জৌনপুরের বাজার–হাটের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে কর্পুর কুমকুম সৌগন্ধিক, চামর, কজ্জল ইত্যাদি বিক্রেতাদের বর্ণনায় এনেছেন। নগরীর এই বর্ণনা বিদ্যাপতির সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। এই বর্ণনার মধ্যে তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের জীবন যাপনের একটি বিশ্বস্ত পরিচয় উপস্থিত করেছেন। আবার কিছু কিছু মানুষের মদ্যপান এবং বিশৃঙ্খল আচরণেরও পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতি এক তুর্কী রাজকর্মচারীর বর্ণনা সূত্রে লিখছেন :

অতি গহ সুশর যোদাএ
খাএ লে ভাঙ্গ ক গুণ্ডা
বিনু কারণহি কোহায়ে
বয়েন তাতলো তমকুণ্ডা।
তুরক তোষারহি চলল হাট
ভমি হেডা চাহই।
আড়ী দিঠি নিহার দবলি
দাঢ়ী থুক বাহই।

এখানকার অন্তিম পঙতিতে এক তুর্কীর একটি অমার্জিত চেহারা পরিস্ফুটিত হয়েছে। সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দোকানদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এবং সে যখন ছুটে চলছে তখন তার মুখ থেকে থুথু নির্গত হয়ে দাড়িতে লেগে যাচ্ছে।

জৌনপুরের বর্ণনায় সুলতানের কর্মচারীদের ক্রূরতা এবং সাম্প্রদায়িতার

বিবরণ আছে। এ বর্ণনা কতটা সত্য বলা কঠিন। কিন্তু এই বর্ণনায় বিদ্যাপতিকে আমরা একজন হিন্দু হিসেবে উপস্থিত দেখি। বিদ্যাপতি তাঁর বর্ণনায় বলছেন যে মুসলমান রাজকর্মচারীরা হিন্দুদের ধরে এনে গো-মাংস বহন করতে বাধ্য করত। ব্রাহ্মণের কপাল থেকে তিলক মুছে দিত। মুসলমানরা দেবালয় ভেঙে মসজিদ তৈরী করত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুলতান প্রতাপশালী ছিলেন এবং তাঁর দেশে শাসনকার্যে শৃঙ্খলা ছিল। যে সুলতানের নিকট বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা কীর্তি সিংহ সহায়তা যাঞ্চা করতে গিয়েছিলেন সেই রাজ কর্মচারীদের হিন্দু বিদ্বেষ বর্ণনা করেও বিদ্যাপতি রাজার ন্যায়পরায়ণতার প্রশস্তি গেয়েছেন। সুলতান ইব্রাহীম শাহ্‌র রাজগৃহের দরজার সামনে যেখানে দর্শনার্থীরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করে সেখানে কীর্তিসিংহ এবং তার ভাই সহজেই দর্শন পেলেন। সুলতান আর্সেলানকে বন্দী করবার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। পথিমধ্যে সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'ভাই খুব অসুবিধায় পড়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে দু'ভাই আর্সেলানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। আর্সেলান পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। কীর্তিসিংহ ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু তাকে পালিয়ে যেতে দেন। এভাবে কীর্তিসিংহ তিরহুত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর ঘোড়ার চলন বিদ্যাপতি অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

অনেক বাজি তেজি তেজি
　　সাজি সাজি আনিয়া
পরক্ক নেহী জাসু নাম
　　দীপ দীপে জানিয়া।
বিশালকন্ধ চারুবন্ধ
　　সত্তি রুও সোহনা
তলগ্ন হাঁতি লাঁধি জাথি
　　সত্ত সেণ খোহনা।
সুজাতি সুদ্ধ কোহে ক্রুদ্ধ
　　তোরি ধাভ কন্ধরা
বিশুদ্ধ দাপে মার ঢাপে
　　চুরি যা রসুন্ধরা।

কীর্তিলতা কাব্যগ্রন্থে বিদ্যাপতি এক নতুন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি

কাব্যগত এক নতুন সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এ-গ্রন্থে কীর্তিসিংহের বীরত্ব বর্ণনা করেছেন। আবার তার দুরবস্থার কথাও বর্ণনা করেছেন। কীর্তিসিংহের বর্ণনায় কীর্তিসিংহকে একজন জীবন্ত পুরুষ বলে মনে হয়েছে।

বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয়ের জন্য শুধু 'পদাবলী'ই যথেষ্ট নয়, কাহিনীকাব্য হিসেবে *কীর্তিলতার* বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

বিদ্যাপতির ভাষা

বিদ্যাপতির জন্ম এমন এক সময় হয়েছিল যখন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সংক্রমণ কাল। সে সময় মধ্যকালীন আর্যভাষা হিসেবে অপভ্রংশ ভাষা জনভাষার স্থান থেকে সরে যাচ্ছিল। মুসলমানদের আক্রমণের ফলে নব্য ভারতীয় ভাষার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল, কিন্তু তবুও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এমন একটি ভাষা পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়নি যাতে মূল্যবান কাব্যানুভূতি প্রকাশ করা চলে। যদিও সে সময় অনেক কবি অপভ্রংশ ভাষায় কাব্য লিখছিলেন, কিন্তু জনসম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে সে ভাষার কাব্য লোকপ্রিয় হতে পারেনি। কবি বিদ্যাপতি এ-অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমরা দেখি যে *কীর্তিলতার* একস্থানে তিনি লিখছেন :

সক্কায়ে বাণী যুহঅন ভাবই।
পাউঅ রস কো মম্ম ন পাঠই।।
দেসিল বুঅনা সব জন মিট্‌ঠা।
তং তইসন জম্প ও অবহট্‌ঠা।।

উক্ত কথন থেকে স্পষ্ট হয় যে বিদ্যাপতির দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা বিদ্বানদের ভাষায় পরিণত হয়েছিল। প্রাকৃত কাব্য নিরস মনে হত। অপভ্রংশ, প্রচলিত অবশ্যই ছিল। কিন্তু দেশী ভাষার তুলনায় তা মিষ্টি লাগত না। এই কারণেই বিদ্যাপতি তাঁর *কীর্তিলতায়* অপভ্রংশের সঙ্গে দেশী ভাষার সমন্বয় ঘটিয়ে মধুর বানিয়েছেন এবং এই সমন্বয়কে 'অবহট্‌ঠ' নাম দিয়েছেন। 'অবহট্‌ঠ' বস্তুত সৌরসেনী অপভ্রংশ এবং ব্রজ ভাষার মধ্যবর্তী ভাষা।

অবহট্‌ঠ ভাষা সমগ্র উত্তর ভারতে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ছিল। এ ভাষার প্রয়োগ দরবারী চারণ কবিরা যেমন করেছেন তেমনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমান ব্যবহৃত হত। এর পরবর্তী রূপ পূর্বী ক্ষেত্রে স্থানীয় বুলির সঙ্গে সংমিশ্রিত

হয়ে ব্যাপক ভাবে একটি সরস ভাষা রূপে উদিত হয়। এর মধ্যে প্রাচীন মৈথিলী এবং ব্রজভাষা প্রচুর মাত্রায় যুক্ত হয়। এই ভাষা ক্রমান্বয়ে পূর্বী ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্ত কবিদের মুখ্য সাংস্কৃতিক ভাষায় পরিণত হয় এবং আমরা একেই কৃষ্ণকাব্যের একমাত্র মাধ্যম-ভাষা ব্রজভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত করে ব্রজবুলি নাম দিয়েছি। এই তথ্যটি না বুঝার ফলে অনেক দিন পর্যন্ত তর্ক চলছিল যে বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলী হিন্দীতে লিখেছেন না মৈথিলীতে লিখেছেন, না বাংলা ভাষায় লিখেছেন। প্রারম্ভিক গবেষণায় বাংলাদেশের পণ্ডিতগণ পদাবলীর ভাষাকে বাংলা ভাষা হিসেবে গণ্য করবার প্রযত্ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ দেখা যেতে পারে। হিন্দী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিদ্যাপতির ভাষাকে হিন্দী ভাষা বলেছেন। এক্ষেত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যেমন খড়িবলি, বাঁগড়ু, বজ্জ, রাজস্থানী, কন্নৌজী, বৈইসবারী অবধি ইত্যাদি ভাষার পরস্পরের মধ্যে ভেদ থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে হিন্দীর অন্তর্গত ভাবা হয়। তেমনি বিদ্যাপতির পদাবলীও হিন্দীর অন্তর্গত। অবশ্য বর্তমানে হিন্দী পণ্ডিতগণ, যেমন ড. দেশরাজ সিংহ ভাটী, ড. শিবপ্রসাদ সিংহ— এঁরা বিদ্যাপতির ভাষাকে এখন আর হিন্দী ভাষা বলছেন না। আবার ড. উমেশ মিত্র, ড. জয়কান্ত মিত্র এবং পণ্ডিত শিবনন্দন ঠাকুর *কীর্তিলতার* ভাষাকে মিথিলা অপভ্রংশ এবং পদাবলীর ভাষাকে শুদ্ধ মৈথিলী বলেছেন। বিদ্যাপতি মিথিলার একজন গৌরবোজ্জ্বল কবি ছিলেন এ-কথা আমরা সকলেই গ্রাহ্য করি। কিন্তু ভাষা-বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বিদ্যাপতির ভাষায় মৈথিলী, মিশ্র-মৈথিলী, সৌরসেনী অপভ্রংশ এবং ব্রজবুলির মিশ্রণ ঘটেছে। গ্রীয়ারসন মৈথিলী ভাষার ওপর গবেষণা করে *মৈথিলী ক্রিস্টোম্যাথী* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ব্রজবুলি সম্পর্কে বিখ্যাত পদাবলীর গবেষক সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, "মিশ্র মৈথিলী বা তথা-কথিত ব্রজবুলির সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। ব্রজ-লীলার বর্ণনা, 'ব্রজবুলি' নাম ও বাংলা অপেক্ষা হিন্দীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকেই ব্রজবুলিকে ব্রজধামের ভাষা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সত্য বটে,বাংলাদেশের ন্যায় ব্রজ-ধামেরও বিগত চারি পাঁচ শত বৎসর মধ্যে ভাষার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে; এবং ব্রজ-ধামের প্রাচীন পদ-কর্তা হরিদাস স্বামী, সূরদাস প্রভৃতির পদাবলীর সহিত বর্তমান মৈথিলী রচনার যে পার্থক্য দেখা যায়— বিদ্যাপতির প্রাচীন পদাবলীর সহিত ব্রজ-ধামের প্রাচীন-পদাবলীর ভাষার পার্থক্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু তাহা হইলেও ব্রজ-ধামের প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন মৈথিলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহাতে

সন্দেহ নাই; বাংলার পরবর্তী পদ-কর্ত্তাদিগের মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজ-বুলির সহিত ঐ পার্থক্য আরও স্পষ্টতর বটে। সুতরাং শুধু 'ব্রজবুলি' কাল্পনিক নামটির জোরে বাংলার ব্রজবুলি কোন মতেই ব্রজ-ধামের প্রাচীন বা আধুনিক ভাষা বলিয়া দাবি করিতে পারে না।''

ব্রজবুলি নিয়ে অতীতে সংশয় সৃষ্টি করেছিলেন রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি বৃজ্জি নামক মিথিলার একটি ক্ষত্রিয় বংশের ভাষা হিসাবে ব্রজবুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। এই উক্তিটি বর্তমানে আর গ্রাহ্য নয়। সতীশচন্দ্র রায় দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তিকে পুরোপুরি কাল্পনিক বলেছেন, বলেছেন যে দীনেশচন্দ্রের মত যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়।

বিদ্যাপতির পরিচিতি যেমন বিহারে, মধ্য প্রদেশে তেমনি বাংলাদেশেও। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী গায়কদের কণ্ঠে গীত হতে হতে বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাষার আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের লিপিকারগণ স্ব-স্ব স্থানের ভাষারূপে বিদ্যাপতির পদ সাজিয়েছেন। যার ফলে কখনো বিদ্যাপতির পদ বাংলার কাছাকাছি এসেছে কখনো তেমনি অন্য ভাষার কাছাকাছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর হস্ত-লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে মৈথিল তালপত্রে এবং নেপালের নেবারী হরফে। পরে বাংলাদেশের কোন কোন পণ্ডিতের হাতে পরীক্ষিত হয়ে বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলার কাছাকাছি এসেছে। পদাবলীর ভাষা অধ্যয়ন করবার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে কোন প্রামাণিক সংশোধিত সংস্করণের অভাব। পদাবলীর অধিকাংশ সংস্করণ লিপিকারদের লেখনবিধির কারণে ভ্রষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি যেহেতু নেপালে পাওয়া গিয়েছে তাই সেখানে 'নেবারী' লিপির অনিবার্য প্রভাব দেখা যায়। আবার বঙ্গাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি শুধু যে শব্দের ভুল উচ্চারণ উপস্থিত করে তাই নয়, বরঞ্চ রচনার ঢঙে বঙ্গীয় প্রভাব সুস্পষ্ট হয়। একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। বঙ্গাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'সুনি' এর জায়গায় 'শুনি' পাওয়া যায়। এভাবে 'শুনল' 'শাস', 'শুনহ' এই রকম ভ্রান্ত প্রয়োগ এসেছে। অনেক পদের মধ্যে বাক্যবিন্যাস, ক্রিয়াপদ তথা সর্বনামের মধ্যেও বঙ্গীয় প্রভাব স্পষ্ট। যেমন 'সবারে', 'কদম্বেরই তরুতলে', 'পরেরী', 'নান্দেরই নন্দন' এভাবে বঙ্গাক্ষরে বিদ্যাপতিকে অনেক পদে বাঙালি পদকর্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষায় ব্রজ-ভাষার প্রভাব পড়েছে প্রভূত। ব্রজ-ভাষার মূল প্রকৃতি হচ্ছে 'ও' কারান্ত। বিদ্যাপতির পদাবলীতে অনেক 'ও' -কারান্ত শব্দ পাওয়া যায়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এ-সংখ্যাগুলো অধিক। আমরা 'ও'-কারান্ত

ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন : 'তিমির মিলও', 'উগও সহস দস দারুণ চন্দ', 'করও কমলবন কেলি ভমরা' ইত্যাদি। এই 'ও'-কারান্ত ব্যবহারটি ব্রজভাষার ভূতকালীন ক্রিয়ারূপের নিদর্শন। ব্রজতে মিল্যৌ, করয়ৌ, পিব্যৌ, চল্যৌ, গয়ৌ— এ সমস্ত রূপ পাওয়া যায়। এরই বিকশিত রূপ আমরা বিদ্যাপতিতে পাই। এভাবে ও-কারান্তের ব্যবহার আমরা বিদ্যাপতিতে উত্তম পুরুষে এক বচনে সামান্য বর্তমানে পাচ্ছি যা ব্রজভাষার সঙ্গে পূর্ণ সাম্য রক্ষা করে। ব্রজ ভাষায় সর্বনামের সাধিত রূপ জা, তা, কা, বা— এ সমস্তর ব্যবহার পাওয়া যায়। এই ব্যবহারের ফলে আমরা জাকৌ, বাকৌ, তাকৌ, কাকৌ, এ সমস্ত রূপ পাই। ব্রজ ভাষায় 'জিস', 'তিস', এর জন্য 'জা' এবং 'তা' ব্যবহার হয়ে থাকে। বিদ্যাপতিতে এ ধরনের প্রয়োগ অনেক আছে। যেমন :

জা লাগি চাঁদন বিখ তইঁ ভেল।।

জা লাগি দখিন পবনও ভেল সায়ক।।

তা পর রতলি নারি।।

তা পতি সবে অসার।।

এই ধরনের বিশিষ্ট রূপের প্রয়োগ কবি সুরদাসে আমরা পাই এবং অনেক পুরনো ব্রজভাষার কবিদের মধ্যেও পাই।

এভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে আমরা বিদ্যাপতির ভাষার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি। আবার নানা ধরনের বিবৃতি এবং সংকোচন আমরা বিদ্যাপতির শব্দ ব্যবহারের মধ্যে পাই। বিবৃতির উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিছু শব্দের উল্লেখ এখানে করতে পারি; যেমন– 'অইপন' (>এপন)· 'অইসন' (>এসন), 'অওকা' (>ঔকা), 'গমাবএ'(> গমাবৈ), 'গরই' (>গরৈ), 'চরই' (>চরৈ), 'ছোড়ও' (>ছাড়ৌ), 'নুকাবএ' (>লুবাবৈ)। সংকোচনের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। যেমন : 'উর' (< অপর)। 'এবই' (< অইবহ)। 'এসন' (< অইসন) ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির কাব্যে স্বরসন্ধিক্রিয়ার কারণে যে স্বরসংকোচ ঘটেছে তাতে শব্দের আকৃতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন 'আঁধারী' (< অঁধআর> অন্ধকার), অরসী (> অরসিকা> আদর্শিকা), উগও (>উগ্মএউ> উদ্‌গমিত), কুম্ভার (> কুম্ভআর> কুম্ভকার), গঁবার(> গাঁবআর> গ্রাম্যকার), মৌর (>ময়ূর)।

বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে প্রায়শ অর্ধস্বর 'য়'-এর স্থানে 'ই' অথবা 'এ' এবং 'ব' এর স্থানে 'উ' অথবা 'ও' ব্যবহার করেছেন। যেমন 'আই' (> আয়> অদ্য), 'আইত' (আ+ √য়া), 'আইতি' (> আয়ত্ত), 'আউতি' (>আবত), 'উপজাওল' (> উপজাব–ল>উৎপাদিত)।

এভাবে অগ্রসর হয়ে স্বরভক্তির উদাহরণ এবং রূপবিচারের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিদ্যাপতির ভাষার ব্যাকরণের স্বরূপ সন্ধান করা যায়। আমরা অতটা ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে যাব না। তার পরিবর্তে বিদ্যাপতির ভাষা, ভাব ও ভঙ্গির নিদর্শন স্বরূপ কিছু পদের উদ্ধৃতি দেব। এ উদ্ধৃতিগুলো দেশরাজ সিংহ ভাটীর সংগ্রহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ড. ভাটীর উদাহরণগুলো যতটা সম্ভব বিদ্যাপতির ভাষার আদর্শরূপ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ড. ভাটী বিদ্যাপতির পদগুলোকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে ভাগ করেছেন : ক. বন্দনা, খ. বয়ঃসন্ধি. গ. নখ-শিখ, ঘ. সদ্যস্নাতা, ঙ. প্রেম প্রসঙ্গ, চ. দূতী, ছ.সখি-শিক্ষা. জ. মিলন. ঝ. সখি সম্ভাষণ, ঞ. কৌতুক. ট. অভিসার. ঠ. ছলনা. ড. মান. ঢ. মান-ভঙ্গ ণ. বিদগ্ধ-বিলাস ত. বসন্ত. থ. বিরহ. দ. ভাবোল্লাস, এবং ধ. স্তুতি।

আমারা সব ক'টি ভাগের উদাহরণ না দেখিয়ে অল্প কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করছি। প্রথম উদাহরণটি 'বন্দনা'র অন্তর্গত।

নন্দক নন্দন কদম্বক-তরু তর,
ঘিরে ঘিরে মুরলি বজাব।
সময় সংকেত-নিকেতন বইসল,
বেরি-বেরি বোলি পঠাব।।
সাসরি, তোরা লাগি,
অনুখন, বিকল মুরারি।
জমুনাক তির উপবন উদবেগল,
ফিরি-ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বেচএ অবইত-জাইত,
জনি-জনি পুছ বনমারি।
তৌহে মতিমান সুমতি মধুসূদন,
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
বন্দহ নন্দ-কিসোরা।।

এ পদটির প্রসঙ্গ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত সময়ে নির্ধারিত পুষ্পস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু রাধা উপস্থিত হল না দেখে তিনি অত্যন্ত বিকল হলেন। এখানে রাধার সখি কৃষ্ণের ব্যাকুলতা বর্ণনা করছেন। যেন রাধা দ্রুত কৃষ্ণ সান্নিধ্যে যায়। আমাদের উদ্ধৃত দ্বিতীয় পদটি হচ্ছে বয়ঃসন্ধির একটি পদ :

সৌসব জৌবন দুহু মিলি গেল।
স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল।
বচনক চাতুরি লহু-লহু হাস
ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস।।
মুকুর হাথ লএ করত সিঙ্গার।
সখি পুছ এ কইসে সুরত বিহার।।
নিরজন উরজ হেরএ কত বেরি
বিহঁসএ অপন পয়োধর হেরি।
পহিলে বদরি-সম পুন নবরঙ্গ।
দিন-দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।
মাধব পেখস অপরূপ বালা।
সৌসব জৌবন দুহু এক ভেলা।।
বিদ্যাপতি কহ তোহেঁ অগেআনি
দুহু এক জোগ এহ কে কহ সমানি।।

এ-পদে কবি নায়িকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করেছেন। আমাদের উদ্ধৃতির তৃতীয় পদটি নখ-শিখের। পদটি এই :

পীন পয়োধর দূবরি গতা
মেরু উপজল কনক লতা।
এ কাহ্ন এ কাহ্ন তোরি দোহাই
অতি অপূরব দেখলি রাঈ।
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে
ফুললি মুধরী কমল সঙ্গে
লোচন জুগল ভৃঙ্গ অকারে
মধুক মাতল উড় এ ন পারে।
ভউঁ হক কথা পুছহ জনু।
মদন জোড়ল কাজর-ধনু।
ভন বিদ্যাপতি দুতি বচনে
এত সুনি কাহ্ন কয়ল গমনে।

এ পদের প্রসঙ্গ হচ্ছে নায়িকা রাধার সৌন্দর্য বর্ণনা। দূতি কৃষ্ণকে এ- বর্ণনা শোনাচ্ছে। আমাদের এর পরবর্তী উদাহরণটি সদ্যস্নাতা পদের, উদাহরণ :

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদয় হনএ পঞ্চবানে।
চিকুর গরএ জল-ধারা।
জনি মুখ-সসি উর রোঅএ অধারা।
কুচ-জুগ চারু চকেবা।
নি অ কুল মিলঅ আনি কোন দেবা।
তে সংকা ভুজ পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে।
তিতল বসন তনু লাগু।
মুনি হক মানস মনমথ জাগু।
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
গুনমতি ধনি পুনমত জন পাবে।

এর প্রসঙ্গ হচ্ছে নায়ক সদ্যস্নাতা নায়িকার সখির কাছে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন। এখন ভাবোল্লাসের একটি পদ উপস্থিত করছি। এ-পদে নায়িকা রাধা সখির কাছে আপন আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছে :

সখি হে, কি পুচসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বখানিঅ
তিল তিল নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল স্রবনহি সুনল
স্রুতি-পথ পরস ন গেল।
কত মধু-জামিনি রভসে গমাওলি
ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তই হিয় জুড়ন ন গেল।
কত বিদগধ জন রস অনুমোদএ
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে ন মীলল এক।

আমাদের সর্বশেষ পদটি একটি স্তুতির পদ। বাক্য বিন্যাসে, ছন্দের অনুরণনে এবং

ভাবের প্রগাঢ়তায় এটি একটি অসাধারণ পদ। এ-পদে সংসারের ভঙ্গুরতা এবং ব্রহ্মবাদের প্রতিপাদন করা হয়েছে। তদুপরি এ-পদে বিদ্যাপতির বিশ্বাসের একটি প্রতিফলনআছে— তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন :

তাতল সৈকত বারি-বিন্দু সম,
　　সুত-সিত-রমনি-সমাজ।
তোহে বিসারি মন তাহে সমরপিনু,
　　অব মঝু হব কৌন কাজ।
মাধব, হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়,
　　অতয় তোহর বিসবাসা।
আধ জনম হম নীন্দ গমায়নু,
　　জথা সিসু কত দিন গেলা।
নিধুবন রমনি-রভস রঙ্গ মাতনু,
　　তোহে ভজব কোন বেলা।
কত চতুরানন ভরি ভরি জাউত,
　　নতুঅ আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত,
　　সাগর লহরি সমানা।
ভনই বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয়,
　　তুঅ বিন গতি নহিঁ আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি,
　　অব তারন ভার তোহারা।

সহায়ক গ্রন্থাদি

১. *বিদ্যাপতি,* ডক্টর শিবপ্রসাদ সিংহ, লোকভারতী প্রকাশন, ইলাহাবাদ, ১৯৭০

২. *বিদ্যাপতি-পদাবলী,* ডক্টর দেশরাজসিংহ ভাটী, বিনোদ পুস্তক মন্দির, আগরা

৩. *কীর্তিলতা,* সম্পাদক ডক্টর দেশরাজসিংহ ভাটী, সাহিত্য মন্দির লিমিটেড, প্রয়াগ

৪. *কীর্তিলতা,* সম্পাদক ডক্টর বাবুরাম সক্সেনা, নাগরী প্রচারিনী সভা।